রোহিঙ্গা সংকট সমাধান

শুধু প্রত্যাবাসন নয়, বিকল্পও ভাবুন

শুধু প্রত্যাবাসনের কথা না ভেবে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বিকল্প ভাবনার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। বিকল্প ভাবনার ক্ষেত্রে রোহিঙ্গাদের সাময়িকভাবে তৃতীয় কোনো দেশে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন তারা। একই সঙ্গে বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদদের সামনে রোহিঙ্গা সংকটের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ ঝুঁকির বিষয়টি তুলে ধরতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্যও তারা সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। গত ১৩ জুন বৃহস্পতিবার সমকাল ও কোস্ট ট্রাস্ট যৌথভাবে আয়োজিত 'রোহিঙ্গাদের মানবিক মর্যাদা : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' শিরোনামে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত অতিথিদের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো–

ছবি : সাজ্জাদ নয়ন

সঞ্চালক

মুস্তাফিজ শফি
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, দৈনিক সমকাল

রেজাউল করিম চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক, কোস্ট ট্রাস্ট

আলোচক

সৈয়দ আবুল মকসুদ
গবেষক ও কলামিস্ট

আবুল কালাম, এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব
কক্সবাজারে শরণার্থী
ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন বিষয়ক কমিশনার

স্টিভেন করলিস
জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক সংস্থা
ইউএনএইচসিআর-এর প্রতিনিধি

ব্যারিস্টার মনজুর হাসান
প্রফেসর, সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

শিরীন হক
নারী আন্দোলন কর্মী

আসিফ মুনির
অভিবাসন বিশেষজ্ঞ

গওহর নঈম ওয়ারা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ

জুলফিকার আলি মাণিক
পরামর্শক, বার্তা বিভাগ বৈশাখী টেলিভিশন
ও স্ট্রিংগার-নিউইয়র্ক টাইমস

আবু মোরশেদ চৌধুরী
সভাপতি
কক্সবাজার চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

সৈকত বিশ্বাস
প্রতিনিধি, কক্সবাজারের ইন্টার সেক্টরাল
কো-অর্ডিনেশন গ্রুপ

শিউলি শর্মা
প্রতিনিধি, জাগো নারী উন্নয়ন সংস্থা

ধারণাপত্র

মজিবুল হক মনির
সহকারী পরিচালক
ক্যাম্পেইন অ্যান্ড পলিসি রিসার্চ

অনুলিখন

রাশেদ মেহেদী
বিশেষ প্রতিনিধি, সমকাল

কামরান সিদ্দিকী
স্টাফ রিপোর্টার, সমকাল

মজিবুল হক মনির

আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হলো তিনটি– ১. জীবন রক্ষাকারী সহযোগিতা, শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধিসহ রোহিঙ্গাদের মানবিক মর্যাদা অব্যাহত রাখা এবং স্থানীয় নাগরিকদের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করতে করণীয় : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট। ২. রোহিঙ্গা পরিস্থিতির মতো ব্যাপক একটি সংকটে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পূর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন : ক. রোহিঙ্গাদের টেকসই প্রত্যাবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে মিয়ানমারের ওপর কীভাবে চাপ অব্যাহত রাখা যায়? খ. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কীভাবে অব্যাহত রাখা যায়? এবং যতদূর সম্ভব সংহত করা যায়। ৩. বৃহৎ পরিসরে রোহিঙ্গা আগমনের প্রায় দুই বছর অতিবাহিত হওয়ার পর বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাব্য সুযোগসমূহের কথা বিবেচনায় রেখে স্থায়ী সমাধানের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য কী করণীয় বলে আপনি মনে করেন? সবাইকে ধন্যবাদ।

মুস্তাফিজ শফি

রোহিঙ্গা সমস্যাটি আমাদের জন্য এক জটিল সামাজিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই সমস্যা সমাধানে শুধু সরকারি পর্যায়ে কাজ করলে হবে না, সবাই মিলে কাজ করতে হবে। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বিশ্বের বুকে মানবিক বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'মাদার অব হিউম্যানিটি' খেতাবও পেয়েছেন। এখন এইসব রোহিঙ্গাকে মানবিক সহায়তা ও মর্যাদা যদি না দেওয়া যায়, তাহলে দায়িত্ব পালন হলো না। আবার আমাদের সামর্থ্যের কথাও চিন্তা করতে হবে। আমরাতো আর সারা জীবন তাদেরকে বসে বসে খাওয়াতে পারবো না। এ জন্য নানামাত্রিক উদ্যোগ নিতে হবে। মিয়ানমারকে চাপ প্রয়োগ করতে হবে। আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীকে সঙ্গে রাখতে হবে। তবে এটা একটি জটিল সমস্যা। সহসা এর সমাধান হবে বলে আমরা মনে করি না। এক্ষেত্রে আজকের এই গোলটেবিল বৈঠক নীতিনির্ধারণী সহায়তা হিসেবে কাজে আসবে। একটি দায়িত্বশীল সংবাদপত্র হিসেবে সমকাল শুধু সংবাদ প্রকাশে নিজেদের কাজ শেষ করে না, সামাজিক ইস্যুতেও ভূমিকা পালন করে। সে উদ্দেশ্যে রোহিঙ্গাদের নিয়ে এই আয়োজন।

শিউলি শর্মা

রোহিঙ্গা আগমনের কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে এখন বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েছে। উভয়ের মাঝে কীভাবে সম্প্রীতি বাড়ানো যায়, সেদিকে নজর দেওয়া জরুরি। রোহিঙ্গা কমিউনিটির নেতা মাঝি হিসেবে পরিচিত। সাধারণত পুরুষদের মধ্য থেকে মাঝি নির্বাচিত হয়। আমরা নারী মাঝিও তৈরি করেছি। মেয়েরা যাতে তাদের কথা বলতে পারেন, সেজন্য এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রোহিঙ্গা নারীরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকটাই মরিয়া, ফলে তাদের পাচারকারীদের হাতে পড়ার অনেক ঝুঁকি রয়েছে।

সৈয়দ আবুল মকসুদ

এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার আয়োজন করায় প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই সমকাল এবং কোস্ট ট্রাস্টকে। বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে, সরকারি কর্মকর্তারা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন না। দায়সারা গোছের কাজ করেন। এটা সামগ্রিকভাবে ভুল ধারণা। বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, অনেক কর্মকর্তা যথেষ্ট দায়িত্ব পালন করেন। ব্যক্তিগতভাবে তারা অত্যন্ত সংবেদনশীল। বিশেষ করে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনের যে বর্ণনা শুনেছি, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। রোহিঙ্গাদের ওপরে রাখাইনে মিয়ানমার বাহিনী যে অত্যাচার চালিয়েছে, তা মানবসভ্যতার ইতিহাসে হাতে গোনা কয়েকটি নারকীয় বর্বরতার একটি। রোহিঙ্গাদের অপরাধ ছিল তাদের ধর্ম, ভাষা এবং জাতিগত পরিচয়। খেয়াল করলে দেখবেন, মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গাদের মধ্যে মুসলিম, হিন্দু ও খ্রিষ্টান আছে। কিন্তু কোনো বৌদ্ধ নেই। তাহলে ধর্ম এখানে একটি ফ্যাক্টর। এ ছাড়া তাদের কোনো অপরাধ ছিল না। এই অপরাধে তাদের প্রতি যে নির্যাতন হয়েছে তা যে কোনো বিবেচনাতেই ভয়াবহ মানবতাবিরোধী অপরাধ। রোহিঙ্গারা যদি সত্যিই অপরাধী হয়ে থাকে, তাহলে মিয়ানমারের প্রচলিত আইনে তাদের বিচার হতো পারত। তাদের মৃত্যুদণ্ড দিলেও কারও আপত্তি ছিল না। কিন্তু তারা সেটা করেনি। বরং গণহত্যা চালিয়ে রোহিঙ্গাদের বের করে দিয়েছে। এ মুহূর্তে অং সান সু চি পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি। এটা আমি বলছি না, সারাবিশ্ব বলছে। কারণ তার অতীতের অনেক সম্মাননা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। যারা সম্মাননা দিয়েছিল, তারাই এটা করেছে। বাংলাদেশ সরকার তাদের শিখিয়ে দেয়নি। যতই সমালোচনা থাকুক, বাংলাদেশ সরকার বিপন্ন রোহিঙ্গাদের জরুরি মানবিক আশ্রয় দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের জন্য একটি উজ্জ্বল ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। বাংলাদেশের জনগণ যে সহমর্মিতা দেখিয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী সীমান্ত খুলে দেওয়ার মাধ্যমে যে উদারতা প্রদর্শন করেছেন, তা আমাদের বজায় রাখতে হবে। এই সম্প্রীতি বজায় রাখা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। বাংলাদেশকে বিশ্ব এখন মানবিক দেশ হিসেবে চিনছে। এ জন্য অবশ্যই বর্তমান সরকারকে ধন্যবাদ।

আবুল কালাম, এনডিসি

রোহিঙ্গা সংকট এবং রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে জনমনে যেসব ধারণা প্রচলিত আছে তার সঙ্গে সত্যিকারের বাস্তবতার পার্থক্য অনেক। তাই রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে প্রচলিত নেতিবাচক ধারণা নাকচ করতে হবে। এই সংকট মোকাবেলায় প্রথম থেকেই যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, রোহিঙ্গারা অতি সাধারণ, ধার্মিক, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষ। তবে তারা মিয়ানমার শাসকদের পদ্ধতিগত নেতিবাচক প্রচারণা ও মানবিক বিপর্যয়ের শিকার। তাদের বিষয়ে কথা বলার সময় আমাদের অবশ্যই পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে এবং তথ্যনির্ভর হতে হবে। রোহিঙ্গাদের অনেক পরিবার এসেছে যাদের পরিবারের সব পুরুষকে হত্যা করা হয়েছে, শুধু নারী সদস্যরা বেঁচে আছেন। এমন অনেক শিশু আছে যাদের বাবা-মাসহ অন্য কোনো অভিভাবক বেঁচে নেই। মানবতার এক করুণ ইতিহাসের অধ্যায় এখন রোহিঙ্গা ক্যাম্প। আবার উখিয়ার জনসংখ্যা যেখানে আড়াই লাখ, সেখানে প্রায় সাড়ে সাত লাখ রোহিঙ্গা এসে নতুন করে আশ্রয় নিয়েছে। ফলে এলাকার জনমিতির মানচিত্রই আমূল বদলে গেছে। এর চাপ কতটা ভয়াবহ, এর ভবিষ্যৎ কতটা বিপদসংকেত তা দেয়, তা বোঝাটা জরুরি। রোহিঙ্গারা এসে অপরাধ করছে সেটাও ঠিক নয়। যেমন কক্সবাজার-টেকনাফ এলাকায় আগে থেকেই ইয়াবা আসত এবং প্রধান চোরাকারবারিরা সবাই বাংলাদেশি। এখন কিছু কিছু রোহিঙ্গা তাদের বাহক হিসেবে কাজ করছে। এ জন্যই রোহিঙ্গাদের একেবারে কর্মহীন রাখা যাবে না। কর্মহীন থাকলে তাদের অপরাধে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি বাড়বে।

স্টিভেন করলিস

আজকের আলোচনার বিষয় মানবিক মর্যাদা। তাদের মানবিক মর্যাদা সমুন্নত রাখতেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের এ দেশের মাটিতে আশ্রয় দিয়েছেন। যার জন্য তাঁকে 'মানবতার জননী' নামে আখ্যায়িত করা হয়। পৃথিবীতে খুব কম দেশই এত সংখ্যক মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে। একটি মানবিক জাতি হিসেবে বাংলাদেশের জন্য এটি একটি গর্ববোধ করার মতো বিষয়।

মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করার অর্থ হলো, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আমার-আপনার মতোই মানুষ। তারা কারও পিতা, কারো ভাই, কারো বোন, কারও বন্ধু। তাদের জীবনেও স্বপ্ন এবং আশা রয়েছে। তাদের মানবিক পরিচয়কে ছাপিয়ে অন্য কোনো কলঙ্কিত পরিচয়ে যেন তাদের আখ্যায়িত করা না হয়, সে বিষয়ে আমাদের বিবেচনা করতে হবে।

বাংলাদেশ সেই সুরক্ষা তাদের দিয়েছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ তাদের যথাযথ মানবিক মর্যাদাও নিশ্চিত করেছে। কাক্সোর জীবনযাপন হয়তো আদর্শ পরিস্থিতি নয়, কিন্তু রোহিঙ্গারা এখানে নতুন জীবন পেয়েছেন। এখানে তারা সমবেত হতে পারেন, তাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে পারেন। তারা তাদের জনগোষ্ঠীর জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজও করছেন।

রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের অসহায় পরিবারগুলোর দ্বারে দ্বারে সেবা পৌঁছে দিতে কাজ করে যাচ্ছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সহযোগিতা করছেন এবং দুর্যোগের সময় যাতে শিশুরা পরিবারের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়, সে ব্যবস্থাও করছেন। পারিবারিক সহিংসতা রোধেও তারা অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী যতদূর সম্ভব তাদের জীবনের দায়িত্ব নিচ্ছেন। অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা তাদের সমাজ গড়ে তুলছেন। তারা মানবিক মর্যাদার একটি নতুন দিক সম্পর্কে জানতে পারছেন, যা মিয়ানমারে সম্ভব ছিল না।

রোহিঙ্গাদের প্রতি সহিংসতা এবং বৈষম্য শুরু হয়েছিল মিয়ানমারে এবং সেখানেই এর সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। ইউএনএইচসিআর তাদের মিয়ানমারের স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্য পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ব্যারিস্টার মনজুর হাসান

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা আগমনের মতো ঘটনা পৃথিবীতে প্রথম নয়। অনেক দেশেই বিপুলসংখ্যক অভিবাসীর আগমন ঘটছে। এসব পরিস্থিতি মোকাবেলায় ওইসব দেশের নিজস্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেসব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিখতে পারি। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশ তরুণ। এদের ঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার আওতায় না আনতে পারলে বড় দুশ্চিন্তার কারণ হবে। কারণ অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। তাই কীভাবে তাদের কর্মসংস্থান হবে সেটা চিন্তা করতে হবে। রোহিঙ্গাদের বিষয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। রোহিঙ্গা ও স্থানীয়দের সমস্যাগুলো শুনতে হবে। সমস্যা বলার সুযোগ পেলে সংকট এমনিতেই হালকা হয়ে যায়। তাই বলতে দেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ।

শিরীন হক

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে মিয়ানমারের সদিচ্ছা নেই। তারা বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছে। মিয়ানমার ইস্যুতে বাংলাদেশ নতজানু ভূমিকা রেখেছে। তাদের বিমান আমাদের আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে। মিয়ানমারের সামরিক শক্তি বেশি বলে এই ভয় হতে পারে। এ জন্য আমাদের কূটনৈতিক তৎপরতা বেশি হওয়া উচিত ছিল। কূটনৈতিকভাবে রোহিঙ্গা বিষয়ে মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় ভূমিকায় যাওয়া উচিত হয়নি। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বহুপক্ষীয় তৎপরতা বেশি কার্যকর হতো। এখনও সে সময় ফুরিয়ে যায়নি। এখানে ঘুঁটি চীনের হাতে। তাই চীনে বাংলাদেশের সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল সফরে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। সমুদ্রে চীনের স্বার্থ আছে। 'প্রিন্সিপাল অব রেসপনসিবিলিটি'কে পুঁজি করে চীনকে কাজে লাগাতে হবে। ভারত নাকি আমাদের পরমাত্মীয়। অথচ রোহিঙ্গা ইস্যুতে তারাও আমাদের পাশে নেই। এর মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে ভারত আমাদের কেমন বন্ধু!

রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত সংকটপূর্ণ, তাদের শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য যে শিক্ষাকেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে, তা অত্যন্ত স্বল্পমেয়াদি চিন্তার ফল। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেখানে দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষাকেন্দ্র চালু করতে হবে, যাতে সব বয়সের শিশু যথার্থ শিক্ষা পায়। রোহিঙ্গা তরুণদের জন্য কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া দরকার। মেয়েদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি করা যেতে পারে। তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং উৎপাদনশীল কাজে যুক্ত করতে হবে যাতে তারা পাচারকারী ও জঙ্গিবাদীদের খপ্পরে না পড়ে। প্রতিটি রোহিঙ্গা পরিবার দ্বারা দশটি করে গাছ রোপণ করে সে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যখন তারা ফিরে যাবে, ওইসব গাছ বাংলাদেশের প্রতি তাদের কিছুটা অবদান হিসেবে মূল্যায়িত হবে।

আসিফ মুনির

রোহিঙ্গাদের ভাসানচরে স্থানান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সবাইকে পুনর্বাসন করার জন্য এ রকম ১০-১৫টি ভাসানচর প্রয়োজন হবে। সেই সক্ষমতা বাংলাদেশের আছে কি-না সেটা বড় প্রশ্ন। এমন পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গাদের অন্যান্য দেশে স্থানান্তরের জন্য কূটনৈতিক তৎপরতার পাশাপাশি বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ দিয়ে কীভাবে এই চ্যালেঞ্জটি মোকাবেলা করা যায়, তা ভাবতে হবে।

রোহিঙ্গাদের জায়গা দিয়ে যে সফলতার গল্প তৈরি হয়েছে, সে বিষয়ে প্রচারণা দরকার। রোহিঙ্গা আগমনের কারণে দুই বছরে স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে। ভাষা ও আচরণে পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গারা মুখোমুখি হয়ে যাচ্ছে। এটা স্বাভাবিক। রোহিঙ্গারা বেশি সুবিধা পাচ্ছে– এমন মনোভাব মোকাবেলা করতে হবে। স্থানীয় মানুষদের মানসিকতা পরিবর্তনে কাজ করতে হবে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের ওপর কী প্রভাব পড়েছে, সেটাও খতিয়ে দেখতে হবে। এখানে বিদেশিরা যে কারিগরি প্রযুক্তি নিয়ে আসছেন, তা কোথায় যাচ্ছে? সার্বিকভাবে একটি 'ক্রিমিনালাইজেশনের' ব্যাপারও থাকতে পারে। রোহিঙ্গাদের যারা পরিচালনা করছেন তারা বাংলাদেশের মানুষ। এসব বিষয়ে গবেষণা কেন্দ্র করা দরকার। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগাতে হবে। একটি সামগ্রিক সাড়া পেতে সরকারকে বহুবার্ষিক পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে।

গওহর নঈম ওয়ারা

রোহিঙ্গাদের নিয়ে অনেক নেতিবাচক সংবাদ প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু একটি প্রতিকূল পরিবেশে এসে রোহিঙ্গা নারীসহ অন্যরা যেভাবে মানিয়ে নিয়েছে, তা সত্যিই অবিশ্বাস্য। সব রোহিঙ্গা ফেরত যাবে না, এটাই বাস্তবতা। এখন তাদের নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি ভাবনা ভাবতে হবে। দেশের সুশীল সমাজকে ট্র্যাক টু ডিপ্লোম্যাসি বা বিকল্প কূটনৈতিক তৎপরতায় সম্পৃক্ত করতে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে শ্রমিক অভিবাসন ও পুনর্বাসন ইত্যাদি সুযোগ নিয়ে তৃতীয় কোনো দেশে প্রত্যাবাসন করা যায়। তৃতীয় দেশে রোহিঙ্গা পুনর্বাসনের ওপর জোর দিতে হবে। কানাডা বলেছিল শিশুদের নেবে। কিন্তু আমরা না করলাম কেন? রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে আমরা ভারত ও চীনের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বসতে পারি না? রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বৃষ্টির পানিকে ব্যবহার করার সুযোগ তৈরি করতে হবে। সেখানে ডাল না দিয়ে শুঁটকি মাছ দেওয়া উচিত। তাহলে স্থানীয় শুঁটকিওয়ালাদেরও আয়ের ব্যবস্থা হবে।

জুলফিকার আলি মাণিক

২৯ বছর সাংবাদিকতা করি। ২০ বছর ধরে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে কাজ করছি। ২০০৪ সালে প্রায় ২০ হাজার রোহিঙ্গা এদেশে ছিল। তখন এ নিয়ে নিউজ করেছিলাম। অনেকে আমাকে বলেছে, এটা কোনো ইস্যু হলো? এখন রোহিঙ্গা নিয়ে মাতামাতির দরকার কি? তখন ইস্যু হয়নি। এখন তো হয়েছে। উদ্বেগটা ১৫ বছর আগের। তখন আমরা সবাই ঘুমিয়েছি। ইস্যু হলে আমরা জাগি, ইস্যু না হলে ঘুমাই। এর ফল এখন পাচ্ছি। এ দায় কূটনীতিক, সিভিল সোসাইটি, সাংবাদিকসহ সবার। বাস্তবতা হচ্ছে, রোহিঙ্গাদের মিয়ানমার কখনোই ফিরিয়ে নেবে না। এখন বাংলাদেশ কীভাবে এ সংকট মোকাবেলা করবে সেটাই বিষয়। রোহিঙ্গাদের কারণে আমাদের মানুষের কী হবে? কক্সবাজার অঞ্চল ভবিষ্যতে কনফ্লিক্ট জোন হলে পরবর্তী প্রজন্মকে আমরা কী জবাব দেব? তাই এ সংকট মোকাবেলার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, সমস্ত জনগণেরও দায় আছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, মানবিকতা নয় বরং ধর্মীয় কারণে রোহিঙ্গাদের আমরা আশ্রয় দিয়েছি। তারা মুসলিম না হয়ে হিন্দু হলে আশ্রয় দিতাম কি-না সেটা ভাবনার বিষয়। এখন যারা রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার নিয়ে কথা বলছেন, তাদের মাঝে এই ১০ লাখ লোককে ভাগাভাগি করে নিতে হবে। অর্থাৎ তৃতীয় দেশে রোহিঙ্গাদের নিয়ে যেতে উদ্যোগী হতে হবে।

আবু মোরশেদ চৌধুরী

২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের ঐতিহাসিক সংখ্যক আগমন ঘটেছে। মানবিক কারণে ১০ লাখ নির্যাতিত মানুষকে আমরা আশ্রয় দিয়েছি। এর বহুমাত্রিক প্রভাব সমাজে পড়েছে। এসব মানুষের প্রত্যাবাসন খুব সহজ ব্যাপার নয়। ১৯৯২ সালের প্রত্যাবাসন চুক্তি টেকসই ছিল না বলে আবার ঘটেছে। দ্বিপক্ষীয় সমঝোতা দুর্বল ছিল। তাই টেকসই প্রত্যাবাসন চাই। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে একটি উৎপাদনশীল শক্তি হিসেবে বিবেচনা করে স্থানীয় বাজারে অবদান রাখার সুযোগ দিতে হবে। এতে তারা কক্সবাজারের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে একটি শক্তি হিসেবে কাজ করবে। তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এক্ষেত্রে মালয়েশিয়া মডেল সামনে রাখা যেতে পারে। তারা ফেরত না যাওয়া পর্যন্ত ডেভেলপ করতে হবে। মানবসম্পদ হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা চালাতে হবে। এই দুর্যোগকে কীভাবে অর্থনৈতিক সুযোগ হিসেবে কাজে লাগানো যায় সেদিকে নজর দেওয়া জরুরি।

সৈকত বিশ্বাস

রোহিঙ্গাদের হ্যান্ডেল করা একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ। মিয়ানমারে গণহত্যা শুরুর পর এক দিনে ৪০ হাজার রোহিঙ্গা আগমনের ঘটনাও ঘটেছে। প্রতিদিন যে হারে মানুষ এসেছে, তাদের জীবন বাঁচাতে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছে। উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন চেষ্টা করেছে। প্রথম দুই সপ্তাহে অগোছালো ব্যবস্থাপনা ছিল। পরে এটা একটি সুন্দর ব্যবস্থাপনার আওতায় এসেছে। মোট ১৪৯টি এনজিও সেখানে কাজ করছে। আমরা সমন্বয় করছি। পাশাপাশি ইউএন এজেন্সি আছে। সংকট শুরুর পর তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্বের কাছে সহায়তা চাওয়া হয়। পরে রোহিঙ্গাদের সহায়তার জন্য গত বছর 'গ্লোবাল জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যানের' অংশ হিসেবে ৯৫১ মিলিয়ন ইউএস ডলারের আপিল করেছিলাম। ৬৬০ মিলিয়ন ডলার পেয়েছি। চলতি বছর ৯২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার চাওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত ২২ ভাগ পাওয়া গেছে।

সামনে আরও আসবে। এ জন্য দাতাদের কাছে বিষয়টিকে জোরালোভাবে তুলে ধরার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।